প্রচ্ছদ-কাহিনী

গণআদালত ১৯৯২ ফিরে দেখা ও মূল্যায়ন

মিল্লাত হোসাইন

'... judges exist everywhere. It is for the peoples of the world and in particular, the American people that we are working.'

-জাঁ-পল সার্ত, সূচনা বক্তব্য রাসেল ট্রাইব্যুনাল, ১৯৬৬

'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ঘোষণা করেছে আগামী ২৬ মার্চ ১৯৯২ প্রকাশ্য গণআদালতে গোলাম আযমের বিচার হবে। এই গণআদালত দেশের প্রচলিত আদালতের প্রতি কোন চ্যালেঞ্জ নয়, স্বাধীনতার শত্রু এই ঘাতকদের বিরুদ্ধে জনগণের রায় ঘোষণার জন্যই এই আদালত গঠন করা হচ্ছে।'

– জাহানারা ইমাম, নির্মূল কমিটির ঘোষণা, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

'The World Tribunal on Iraq places its faith in the consciences of millions of people cross the world who do not wish to stand by and watch while the people of Iraq are being slaughtered, subjugated, and humiliated.'
–অরুন্ধতী রায়, সূচনা বক্তব্য, ইরাক ট্রাইব্যুনাল, ২৪ জুন ২০০৫

'সরকার যদি বিচার করতে ব্যর্থ হয় তাহলে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ গণআদালত গঠন করে গোলাম আযমসহ সকল রাজাকার, আলবদরের বিচার করবে।'[১] ১৯৭৫-এ সপরিবারে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা, সেনাবাহিনীতে অভ্যুত্থান-পাল্টা অভ্যুত্থান, কারাগারে জাতীয় চার নেতার হত্যা, তথাকথিত 'সিপাহি-জনতার অভ্যুত্থান', মুক্তিযোদ্ধা সেনাকর্মকর্তা হত্যা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বদলে যায় বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের চরিত্র ও গতি-প্রকৃতি। এসবের ভেতর দিয়ে ক্ষমতাসীন মুশতাক-সায়েম-জিয়ার সামরিকতন্ত্র নিজেদের নিরাপত্তা ও ক্ষমতা সুসংহত করা কিংবা কারো কারো মতে বাংলাদেশকে ঘিরে চলমান একটি 'জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত' বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য নেয়া রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলো একে একে বন্ধ করে দিয়ে প্রচলিত আইন-আদালতে তাদের বিচার করার চূড়ান্ত অনিচ্ছা জানিয়ে দেয়। তখন ১৯৮১ সালের ২১ মার্চ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের তৎকালীন কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান এবং মুক্তিযুদ্ধে নবম সেক্টরের কমান্ডার লে. ক. (অব.) কাজী নূরুজ্জামান (বীরউত্তম) উপরোক্ত বক্তব্য দিয়ে এদেশে সর্বপ্রথম গণআদালতের মাধ্যমে তাদের বিচার করার ঘোষণা দেন। এরপর একই বছরের ২৬ এপ্রিল মুক্তিযোদ্ধা সংসদ একটি ৭ দফা কর্মসূচি ঘোষণার মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের গণআদালতে বিচারের বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করে। কিন্তু এ ঘটনা বিবৃতি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। এরপর সময় গড়িয়ে শেষ হয় আরো ১১ বছর।

২৯ ডিসেম্বর ১৯৯১। খবরের কাগজের বরাতে আমরা একটি সংবাদের মুখোমুখি হই। সংবাদটি হলো– তখন পর্যন্ত বাংলাদেশের নাগরিক নয় এবং দীর্ঘদিন যাবৎ অবৈধভাবে বসবাসকারী পাকিস্তানি নাগরিক গোলাম আযমের বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান নির্বাচিত হওয়া।[২] জামায়াতে ইসলামীর সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম শুরার বৈঠকে গোলাম আযমকে তাদের আমির নির্বাচিত করা হয়। প্রসঙ্গত উলে-খ করা দরকার যে, দালাল আইন বলবৎ হওয়ার তারিখ ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি থেকে ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বরে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার এই মধ্যবর্তী সময়ে সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দালালদের যে তালিকা প্রকাশ করেছিল সেখানে ১১ নম্বরে ছিল গোলাম আযমের নাম। নোটিশ অনুযায়ী ২২ ফেব্রুয়ারি '৭২ তারিখের মধ্যে ট্রাইব্যুনালে হাজির না হওয়ার কারণে বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আদেশ ১৯৭২-এর ৩ ধারার আওতায় সরকার ১৯৭৩ সালের ১৮ এপ্রিলে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বলে যে ৩৯ জনের নাগরিকত্ব বাতিল করে তাদের অন্যতম গোলাম আযম। ১৯৭৬ সালের ১৮ জানুয়ারি জিয়া সরকার নাগরিকত্ব ফেরত দেয়ার যে প্রেসনোট জারি করে তার সুযোগে গোলাম আযম নাগরিকত্ব ফেরতের আবেদন জানালে সেটা ১৯৭৬, ১৯৭৭, ১৯৭৮, ১৯৭৯ ও ১৯৮১ সালে পাঁচ দফা প্রত্যাখ্যাত হয় বটে, কিন্তু বাস্তবে ১৯৭৮ সালের ১১ জুলাই অসুস্থ মাকে দেখার কথা বলে পাকিস্তানি পাসপোর্ট নিয়ে ৩ মাসের জন্য বাংলাদেশে আসেন তিনি।[৩] পরবর্তীকালে ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরও অবৈধভাবে এ দেশে বসবাস করতে থাকে, স্পষ্টতই সরকারের বরাভয়ের আশীর্বাদে। পরে নাগরিকত্ব বাতিলের উক্ত প্রজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে রিট দায়ের করা হলে শুনানি শেষে দ্বৈত বেঞ্চ দ্বিধাবিভক্ত রায় দেয়। জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মোহাম্মদ ইসমাইল উদ্দীন সরকার রিট প্রত্যাখ্যান করলেও অন্য বিচারপতি বদরুল ইসলাম চৌধুরী রিট গ্রহণ করে রায় দেন।[৪] নিয়মানুযায়ী বিভক্ত রায় হাইকোর্ট বিভাগের তৃতীয় বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরীর কাছে গেলে তিনি নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার পক্ষে রায় দেন (৪৫ ডিএলআর, ১৯৯৩ পৃ. ৪৬৪)। পরবর্তীকালে ১৯৯৪ সালে আপিল বিভাগের বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বিচারপতি এটিএম আফজাল, বিচারপতি মোস্তফা কামাল ও বিচারপতি লতিফুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ 'বাংলাদেশে জন্ম' এই নীতির ওপর ভিত্তি করে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার পক্ষে রায় দেয় (৪৬ ডিএলআর, এডি, ১৯৯৪)।

যাই হোক, গোলাম আযমের আমির হওয়ার ঘটনায় দেশের সর্বস্তরে যে ক্ষোভ জন্ম নিয়েছিল তার ভেতর থেকেই ১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি দেশের মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিক, সংস্কৃতিকর্মী তথা সামগ্রিকভাবে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' নামে ১০১ সদস্যবিশিষ্ট একটি ফোরাম গঠন করে সরকারের কাছে ২৫ মার্চের মধ্যে গোলাম আযমকে দেশ থেকে বহিষ্কারের দাবি জানানো হয়। অন্যথায় সে বছরের ২৬ মার্চ প্রকাশ্য গণআদালতে '৭১-এর যুদ্ধাপরাধের দায়ে তার বিচার করা হবে। এভাবেই সূত্রপাত ঘটে গণআদালতের। '৭৫-এর পটপরিবর্তনের পর ক্ষমতাসীন শ্রেণীর প্রত্যক্ষ মদদে যখন প্রচলিত আদালতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি প্রায় অবসিত হয়ে যাচ্ছিল তখন তাদের বিচারের এ নাগরিক উদ্যোগ সারাদেশে সৃষ্টি করেছিল অভূতপূর্ব গণজাগরণ, যা আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামোতে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিটি গোষ্ঠীকে নাড়িয়ে দিয়েছিল।

যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, গণহত্যা ও আগ্রাসন ইত্যাদি বিচারের জন্য নাগরিক উদ্যোগে গণআদালত গঠনের বিষয়টি আধুনিক বিশ্বে একটি জনপ্রিয় ধারণা। বিশেষ করে গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এ সংক্রান্ত অনেকগুলো গণআদালত বসেছে। ১৯৬৬ সালের ১৩ নভেম্বর ব্রিটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল ও ফরাসি দার্শনিক ও সাহিত্যিক জাঁ-পল সার্ত-এর উদ্যোগে ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসন ও গণহত্যার তদন্ত এবং মূল্যায়নের লক্ষ্যে গঠিত ১০১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি যে 'বিবেকের আদালত' গঠন করে, সেটাই এধরনের গণআদালতের প্রথম উদ্যোগ বলে স্বীকৃত। পরবর্তীকালে এরকম যতো উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তাতে মডেল হিসেবে গণ্য হয়েছে রাসেল ট্রাইব্যুনাল নামে খ্যাত এ গণআদালতের কার্যক্রম।

এই গণআদালতে আন্তর্জাতিক চুক্তি ভঙ্গ করে ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসন, পরীক্ষামূলক অস্ত্র ব্যবহার, হাসপাতাল-স্কুল ও অপরাপর বেসামরিক স্থাপনায় বোমাবর্ষণ, যুদ্ধবন্দিদের নির্যাতন ও অঙ্গচ্ছেদ এবং গণহত্যার তদন্ত করা হয়। সাক্ষ্যপ্রমাণ বিচার-বিবেচনা করে আদালত মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিন্ডন বি জনসন ও তার প্রশাসনকে এসব অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করে। এর আগে রাষ্ট্রপতি জনসনসহ মার্কিন প্রশাসনকে ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য ও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আনুষ্ঠানিক অনুরোধও জানানো হয়।[৫] রাসেল ট্রাইব্যুনালের সাফল্যের পর পৃথিবীর নানা দেশে বিভিন্ন অ্যাজেন্ডা নিয়ে অনেকগুলো গণআদালত বসে। এর মধ্যে উলে-খযোগ্য ১৯৭৯ সালে ইতালির বোলোন-এ মানবাধিকার ও গণঅধিকার Rights of peoples লঙ্ঘনের ঘটনা পর্যালোচনার লক্ষ্যে গঠিত স্থায়ী গণআদালত (পার্মানেন্ট পিপলস ট্রাইব্যুনাল সংক্ষেপে টিপিপি)। এটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ৩১টি অধিবেশন পরিচালনা করেছে এবং বর্তমানেও চালু আছে। সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু গণআদালত গঠিত হয়েছে যার মধ্যে উলে-খযোগ্য হলো ২০০০ সালের উইমেন্স ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল, যা টোকিও ট্রাইব্যুনাল নামে পরিচিত; ২০০৩ সালে ভারতীয় লেখক অরুন্ধতী রায়ের উদ্যোগে ইঙ্গ-মার্কিনি ইরাক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তুরস্কে গঠিত ওয়ার্ল্ড ট্রাইব্যুনাল অন ইরাক (ডবি-ওটিআই) এবং ২০০৭ সালে ভারতে বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠীর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে গঠিত স্বাধীন গণআদালত বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট পিপলস ট্রাইব্যুনাল (আইপিটি)। সর্বশেষ ২০০৭-এর ৩ নভেম্বর বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও এডিবির কার্যক্রমের বিরুদ্ধে একটি গণআদালত গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়। গণআদালত গঠনের পেছনে তাত্ত্বিক কারণ যা-ই থাক না কেন, প্রধানতম বাস্তব কারণ– নানা জটিল ও কুটিল রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক ও সামরিক স্বার্থ এবং সমীকরণের বেড়াজালে পড়ে রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যখন কোনো গুরুতর অপরাধের বিচার করতে অসমর্থ হয় কিংবা অনীহা প্রকাশ করে, তখন বিশ্বের মানবতাবাদী ও ন্যায়বিচারকাঙ্ক্ষী নাগরিক সমাজের গণআদালতে এসব অপরাধের প্রতীকী বিচার করতে বারে বারে এগিয়ে আসা।

জাহানারা ইমাম প্রদত্ত গণআদালতের রায় রিলে করছেন এডভোকেট গাজীউল হক

শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে এই গণআদালত গঠন করাটা প্রথমে যে প্রশ্ন জাগায়, তা হলো '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে আমাদের রাষ্ট্র কি কোনো উদ্যোগ নিয়েছিলো এবং তা কি সফল হয়নি? দুটো প্রশ্নের একটি সাধারণ জবাব হলো– হ্যাঁ।

পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে ফেরার পথে ৮ জানুয়ারি, ১৯৭২ লন্ডনে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান যে ঘোষণা দেন, তা পরদিন দৈনিক ইত্তেফাকে ছাপা হয় এভাবে– 'বাংলাদেশে যে গণহত্যা হইয়াছে তাহার বিচার হইবে।' ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রথম জনসভায় তিনি এ ইচ্ছা পুনর্ব্যক্ত করেন। তারই ধারাবাহিকতায় সরকার আইন প্রণয়ন ও বিচারের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছিল। সেসব বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলার পূর্বে এ বিষয়ে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যটি জানানো প্রয়োজন। সেটি হলো, স্বাধীন বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রক্রিয়ার সর্বপ্রথম উদ্যোগটি কিন্তু নেয়া হয় সরকারের বাইরে নাগরিকদের পক্ষ থেকে। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের ১৩ দিনের মাথায় ১৯৭১ সালের ২৯ ডিসেম্বর জহির রায়হান গঠন করেছিলেন 'বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত কমিশন'। ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি তাঁর অন্তর্ধানের পর কমিশনের কাজ আর এগোয়নি।

১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি সরকার পাকিস্তানিদের এদেশীয় সহযোগীদের বিচারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কলাবরেটরস (স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল) অর্ডার ১৯৭২ প্রণয়ন করে, যা ব্যাপকভাবে দালাল আইন নামে উলি-খিত হয়। এই আইনের আওতায় ১৯৭২ সালের মার্চ নাগাদ সারাদেশের সব জেলা মিলে মোট ৭৩টি ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নানান চাপের মুখে ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর জারিকৃত অতি বিখ্যাত সরকারি প্রেসনোটটির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট অপরাধীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ৩৭,৪৭১ ব্যক্তিকে আটক করা হয়। এদের মধ্যে ২,৮৪৮ জনের বিচার সম্পন্ন হয় এবং ৭৫২ জনকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেয়া হয়। অবশিষ্টরা খালাস পায়।[৬] ১৯৭২ সালের ৮ জুন কুষ্টিয়ার জেলা ও স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের জজ রবীন্দ্র কুমার বিশ্বাস কুষ্টিয়ার মিরপুর নিবাসী চিকন আলী নামে এক দালালকে মৃত্যুদণ্ড দেন (স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল কেস নং-১/৭২)। পরবর্তীকালে ২৭ সেপ্টেম্বর '৭২ হাইকোর্ট বিভাগ শাস্তি কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় (ক্রিমিনাল আপিল নং-৩৮/৭২)।[৭] উক্ত সাধারণ ক্ষমার আওতায় প্রায় ২৬ হাজার জনকে ক্ষমা করা হয়। অবশিষ্টরা সম্মুখীন হয় বিচার প্রক্রিয়ায়।

১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তৎকালীন সায়েম-জিয়া সরকার দালাল আইন বাতিল করার ফলে এ আইনে বন্দি অবশিষ্ট ১১ হাজার ব্যক্তি আপিল করার মাধ্যমে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হয়।

দালাল আইনে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্ভব না হওয়ায় ১৯৭৩ সালের ২০ জুলাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইব্যুনালস) অ্যাক্ট প্রণয়ন করে বাংলাদেশ সরকার। যার আওতায় ভারতে বন্দি

পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু ১৯৭৪ সালের ১৯ এপ্রিল দিলি-তে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের মধ্যে যে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় তার আওতায় ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় বাংলাদেশ। অবশ্য উক্ত আইনটি এখনও বলবৎ আছে।

এভাবে কখনো রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা কিংবা কখনো ক্ষমতাসীনদের প্রত্যক্ষ মদদে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আইনি প্রক্রিয়া যখন থমকেই কেবল যায়নি, উল্টো তাদের পুনর্বাসন ও রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় জিয়ার সরকার, তখন পথে নামতে হলো এ দেশের নাগরিকদের। ১৯৮১ সালে জিয়া সরকারের শেষ দিকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য একটি আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে।

ইতোপূর্বে উদ্ধৃত কাজী নূরুজ্জামানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও প্রতিরোধের যে ডাক দেয়, তাতে শামিল হয় দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি। এর ফলে আন্দোলন এতোটাই তুঙ্গে ওঠে যে সংসদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাদের সাথে সংলাপে বসতে বাধ্য হন। বৈঠকে সংসদের পূর্বোক্ত ৭ দফার যৌক্তিকতা উপলব্ধি ও তা বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়ার প্রেক্ষিতে সংসদ তাদের আন্দোলন স্থগিত করে। ইতোমধ্যে সরকার তৎকালীন সংস্থাপনমন্ত্রী মাজেদুল হকের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের দাবির বিষয়ে সুপারিশ দেয়ার জন্য একটি কমিটিও গঠন করে। ঠিক তার পরপরই ৩০ মে ১৯৮১ তারিখে সেনাঅভ্যুত্থানে প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হওয়ার পর সাত্তার সরকারের মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নেতাদের জিয়া হত্যার সাথে জড়ানোর চেষ্টা এবং ধরপাকড়ের মুখে আন্দোলন গতি হারিয়ে ফেলে।

এটা সত্যি যে, স্বাধীনতাবিরোধীদের রুখবার একটি আন্দোলন সবসময়ই জারি ছিল এবং এখন পর্যন্ত আছে। কিন্তু এর পরবর্তী তাৎপর্যপূর্ণ প্রচেষ্টাটির রসদ সংগ্রহ করতে আমাদের যে আরও ১১ বছর এবং কারো কারো ভাষায় গোলাম আযমের আমিরত্ব লাভের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল তা ইতোমধ্যেই উলে-খ করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল (এমএল), বাসদ, জাতীয় জনতা পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি, সোশ্যালিস্ট পার্টি, ছাত্রলীগ, জাতীয় ছাত্রলীগ, ছাত্র ফেডারেশনের বিবৃতি ছাপা হয় খবরের কাগজগুলোতে।[৮] রাজপথে প্রথম বিক্ষোভ মিছিল করে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ (আহাদ-আজিজ) ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯১।[৯] বরাবরের মতো এবারও প্রতিবাদ প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে অক্লান্ত যোদ্ধা কাজী নূরুজ্জামান, যিনি এজন্য ১৯৮১ সালে জেল পর্যন্ত খেটেছেন। তিনিসহ শাহরিয়ার কবির, জাহানারা ইমাম ও আরো বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধার সাংগঠনিকভাবে প্রতিবাদ করার ভাবনা ও কর্মতৎপরতা থেকেই ১৯ জানুয়ারি ১৯৯২ তারিখে, 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠিত হয়, যার আহ্বায়ক নির্বাচিত হন জাহানারা ইমাম। কমিটির গণআদালতে গোলাম আযমের বিচারের ঘোষণা সংবলিত বিবৃতি খবরের কাগজে ছাপা হওয়ার পরপরই বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ছাত্র সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গ তাকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাতে শুরু করে। এর মধ্যে প্রথমদিকের উলে-খযোগ্য কয়েকটি সংগঠন হলো– মুক্তিযোদ্ধা সংসদ (মাহফুজ-কবির), শহীদ লে. সেলিম মঞ্চ, প্রজন্ম '৭১, গ্রাম থিয়েটার। রাজনৈতিক দলের মধ্যে ছিল জাতীয় পার্টি ও স্বাধীনতাবিরোধী চক্র ছাড়া প্রায় সবাই, প্রায় সমস্ত বামদল, প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন। ২১ জানুয়ারি ঢাকায় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ও কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।[১০] ২২ জানুয়ারি জামায়াতের তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল মতিউর রহমান নিজামী কমিটির লোকজনদের 'সংবিধানের শত্রু' আখ্যায়িত করে একটি বিবৃতি দেয়। ২৩ জানুয়ারি এর জবাব দেন জাহানারা ইমাম। ২৭ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ, দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, পাঁচ দলীয় জোট ও গণতান্ত্রিক বিপ-বী জোট কমিটির ঘোষণার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। ১ ফেব্রুয়ারি গণআদালতের পক্ষে স্বাক্ষর অভিযান শুরু হয়। ২ ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন তথ্যমন্ত্রী নাজমুল হুদা এক সাক্ষাৎকারে গণআদালতকে সংবিধান-বহির্ভূত, বেআইনি কাজ, বুদ্ধিজীবীরা কতো দায়িত্বহীন তা বলে লাভ নেই, গোলাম আযমের বাংলাদেশে অবৈধ অবস্থানকে 'মানবিক অধিকার' ইত্যাকার মন্তব্য করলে কমিটির পক্ষ থেকে তথ্য ও যুক্তি তুলে ধরে তার প্রতিবাদ জানিয়ে সেদিনই একটি বিবৃতি পাঠানো হয় খবরের কাগজগুলোতে। ৩ ফেব্রুয়ারি গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য ও ছাত্রলীগ (আওয়ামী লীগ সমর্থিত) একাত্মতা ঘোষণা করে। ১০ ফেব্রুয়ারি কমিটির পক্ষ থেকে প্রথম লিফলেট বের হয়। এর মধ্যে দেশের ৫২ জন আলেম গণআদালতকে সমর্থন করে বিবৃতি দেন, পরবর্তীকালে আরো ২০০ জন আলেম আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। ইতোমধ্যে ২৪ জানুয়ারি '৯২ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের (আহাদ-আজিজ) উদ্যোগে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী চক্র প্রতিরোধ মঞ্চ' নামে আরেকটি সংগঠনের জন্ম হয়। এসব সংগঠনের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে আন্দোলনকে বেগবান করা ও এক বিন্দুতে নিয়ে আসার তাগিদ থেকেই ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, ৬৯টি সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠন করা হয় 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি',[১১] যা সমন্বয় কমিটি নামে পরিচিত হয়। জাহানারা ইমাম এ কমিটিরও আহ্বায়ক নির্বাচিত হন।

সমন্বয় কমিটির সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের ফলে অতিদ্রুত আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ছাত্রশিবিরের 'সাথী সম্মেলন'-এ যে কোনো মূল্যে গণআদালত প্রতিরোধের ঘোষণা দিলে ২০ ফেব্রুয়ারি মুক্তিযোদ্ধা হাইকমান্ড নামক একটি সংগঠনের পক্ষে কাজী নূরুজ্জামান জামায়াত ও স্বাধীনতাবিরোধীদের সতর্ক করে দিয়ে একটি ঘোষণা প্রকাশ করেন। এতে বলা হয়, *'জামাতের নেতাদের আমরা হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, গত বিশ বছর মুক্তিযোদ্ধাদের অনৈক্যের সুযোগ তারা যেভাবে গ্রহণ করেছে এবার আমরা তা হতে দেবো না। আমাদের জনগণের উপর যে কোন হামলার দাঁতভাঙা জবাব দেয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত রয়েছি। ... একই সঙ্গে সরকারকেও আমরা জানিয়ে দিতে চাই স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে জামাতীদের ফ্যাসিবাদী তৎপরতার বিরুদ্ধে তারা যদি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন তার দায়দায়িত্ব অবশ্যই তাদের বহন করতে হবে।'* এরপর

২৬ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘোষণা প্রকাশ করা হয়। মূলত জামায়াত ও স্বাধীনতাবিরোধীদের গণআদালতকে প্রতিহত করার ঘোষণা ও নানান তৎপরতার মুখে আন্দোলনের কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা রাখার উদ্দেশ্য থেকেই এসব ঘোষণা দেয়া হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি গঠিত হয় নির্মূল কমিটির ঢাকা মহানগরী শাখা, যা ১ মার্চ ঢাকায় গণআদালতের পক্ষে প্রথম সমাবেশের আয়োজন করে।[১২] ৩ মার্চ বায়তুল মোকাররমের সামনে সমন্বয় কমিটির প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।[১৩] ৭ মার্চ ১০০ জন সংসদ সদস্য এক যৌথ বিবৃতিতে গণআদালতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে।[১৪] আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের নিরাপত্তার জন্য মৃত্যুঞ্জয় স্কোয়াড গঠন করা হয় ২০ মার্চ। দেশের সম্ভাব্য সব এলাকা তো বটেই দেশের বাইরেও কমিটির শাখা গড়ে ওঠে। আন্দোলনের সপক্ষ ও বিপক্ষের সব শক্তিই তাদের স্ব-স্ব সামর্থ্যের পুরোটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার ফলে দেশ জুড়ে সৃষ্টি হয় এক মহাযজ্ঞের।

১৬ মার্চ ১৯৯২ রেজিস্টার্ড ডাকযোগে গোলাম আযমকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমন পাঠানো হয়। ১৯ মার্চ জামায়াতের সাথে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠকে সরকারের সন্তোষজনক পদক্ষেপ না নেয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে জামায়াত। অবিলম্বে এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নিতে সরকারকে চাপ দেয়া হয়। মন্ত্রী– সরকার সচেতন আছে ও পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে বলে জানান।[১৫] গোলাম আযম বিষয়ে দায়িত্বশীল সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে ২২ মার্চ '৯২ দৈনিক সংবাদ জানায়, সরকার তিনটি প্রস্তাব বিবেচনা করছে। এগুলো হলো– ১. দেশ থেকে বহিষ্কার, ২. গ্রেফতার, ৩. সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আপিল বিভাগের মতামত নেয়া।

২২ মার্চ কেবিনেট মিটিংয়ে গণআদালত ও গোলাম আযম ইস্যুতে আলোচনা হয়। অন্যদিকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[১৬] ২৩ মার্চ গণআদালতের কার্যক্রম বেআইনি ও ২৬ মার্চের বিচার স্থগিত রাখার জন্য জনৈক অ্যাডভোকেট সোহরাব হোসেনের দায়েরকৃত দেওয়ানি মামলার গ্রহণযোগ্যতার শুনানি ৩০ মার্চ ধার্য করা হয়।[১৭] ২৫ মার্চ 'তথাকথিত' গণআদালতের উদ্যোক্তাদের প্রতি সংবিধান পরিপন্থী কার্যকলাপ এবং আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া হতে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয় সরকারের পক্ষ থেকে।[১৮]

২৫ তারিখ রাতে পুলিশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সামনে গণআদালতের মঞ্চ তৈরি করতে দেয়নি।[১৯] পরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের শিশুপার্ক সংলগ্ন একটি স্থানে চারটি ট্রাকের ওপর গণআদালত বসে। যেখানে ১৯৭১ সালে শেখ মুজিবুর রহমান তার ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ দিয়েছিলেন। পুলিশের অব্যাহত বাধার মুখে এবং মঞ্চ না থাকায় মামলার বিচার কার্যক্রম ও শুনানি অনুষ্ঠিত হয় সুপ্রিমকোর্ট প্রাঙ্গণে। গণআদালত বানচালের জন্য পুলিশ সকাল ৮টা থেকে সারা শহরে সর্বাত্মকভাবে বাধা দিলেও ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জনতার জোয়ারের মুখে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। একাত্তরে ধর্ষণের শিকার কুষ্টিয়ার তিনজন নারীও গণআদালতে অভিযোগ জানাতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।[২০] এসবের মধ্যেই পূর্বঘোষিত সময়ে ২৬ মার্চ ১৯৯২ তারিখে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত গণআদালতে গোলাম আযমের বিচার সম্পন্ন হওয়ার পর দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে কয়েক লাখ মানুষের সামনে মাইক ছাড়াই রায় ঘোষণা করেন আদালতের চেয়ারম্যান জাহানারা ইমাম।

১২ সদস্যবিশিষ্ট গণআদালতে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ১২টি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এর ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে ১০টি বিচার্য বিষয় স্থির করা হয়। এগুলোর মধ্যে আছে ১৯৭১-এর ২৬ মার্চ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত নারী-পুরুষ-শিশু হত্যা, ২ লাখ নারী অপহরণ ও ধর্ষণে পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তার মাধ্যমে কৃত যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ; আল বদর, আল শামস গঠন; গণহত্যায় উস্কানি ও প্ররোচনা দান; মুক্তিযোদ্ধাদের নিরীহ পরিবার-পরিজনদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ; ধর্মের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে মানুষ হত্যাকে জায়েজ করা; অনুগত বাহিনী দ্বারা লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ করানো; বুদ্ধিজীবী হত্যা, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো ইত্যাদি। এসব অভিযোগের পক্ষে সাক্ষ্য দেন ১৫ জন। এদের মধ্যে আছেন মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, ধর্মবেত্তা প্রমুখ। গোলাম আযমের অনুপস্থিতিতে তার পক্ষ সমর্থনের জন্য একজন আইনজীবীও নিয়োগ করা হয়। আদালত তার রায়ে বলে–

"...প্রদত্ত সাক্ষ্য সত্য এবং দাখিলকৃত প্রদর্শনীসমূহ অকাট্য বিবেচনা করে সর্বসম্মতভাবে অভিযুক্ত গোলাম আযমের বিরুদ্ধে প্রতিটি অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে মনে করি এবং আনীত প্রতিটি অভিযোগের প্রত্যেক অপরাধে তাকে দোষী সাব্যস্ত করছি। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশে উপরোক্ত অপরাধ দৃষ্টান্তমূলক মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ।

যেহেতু গণআদালত কোন দণ্ডাদেশ কার্যকর করে না, সেহেতু অভিযুক্ত গোলাম আযমকে আমরা দোষী সাব্যস্ত করে তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছি।"

গণআদালতের রায় বাস্তবায়নের জন্য প্রথম পর্যায়ে সরকারকে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত সময় দেয়া হয়। এরপর ১৮ মে পর্যন্ত আরেকদফা সময় বাড়ানো হয়।[২১]

গণআদালতের পূর্বে এবং পরে সরকার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক মহলও স্ব-স্ব মতাদর্শের ভিত্তিতে ভূমিকা রেখেছে। এক্ষেত্রে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন তৎকালীন বিএনপি সরকারের ভূমিকা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। গণআদালতের তাত্ত্বিক পরিকল্পনা ও সাংগঠনিক কর্মতৎপরতায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সরকারি মালিকানাধীন সাপ্তাহিক বিচিত্রায় কর্মরত সাংবাদিকদের। বিচিত্রার সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী ও নির্বাহী সম্পাদক শাহরিয়ার কবিরের নেতৃত্বাধীন এই অংশটিকে অনানুষ্ঠানিকভাবে 'বিচিত্রা গ্রুপ' নামেও ডাকা হতো। নির্মূল কমিটির কতিপয় সদস্যও বিএনপিপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন। বিএনপির মুক্তিযোদ্ধা অংশ ও মন্ত্রী-সাংসদদের কেউ কেউ এ আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন বলে শোনা গেলেও সামগ্রিকভাবে বিএনপির হাইকমান্ড আন্দোলন সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাবই পোষণ করেছে। গণআদালতের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে অচিরেই চাকরিচ্যুত হন শাহরিয়ার কবির।

অন্যদিকে কট্টরপন্থীরা, যারা নিজেরাই ছিল হয় স্বাধীনতাবিরোধী

কিংবা তাদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট, তারা তৎপর ছিল আন্দোলন বানচালের জন্য। বস্তুত আন্দোলন যতই পরিণতি লাভ করছিল ততোই সরকার আন্দোলনকারীদের ওপর খড়্গহস্ত হচ্ছিল। ২৩ মার্চ ১৯৯২ তারিখে সরকার গোলাম আযমকে কেন দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে না এবং গণআদালত গঠনের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেয়া হবে না মর্মে গণআদালতের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ২০ জনের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাও নোটিশসহ মোট দু'টি নোটিশ জারি করে। ২৪ মার্চ সরকার বেআইনিভাবে এ দেশে বসবাসের দায়ে গোলাম আযমকে গ্রেফতার করে। ২৮ মার্চ গণআদালতের ২৪ জন উদ্যোক্তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করে সরকার। এরা হলেন– জাহানারা ইমাম, গাজীউল হক, ড. আহমদ শরীফ, মাযহারুল ইসলাম, ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, ফয়েজ আহমদ, কবীর চৌধুরী, কলিম শরাফী, মাওলানা আবদুল আউয়াল, লে. ক. (অব.) কাজী নূরুজ্জামান, লে. ক. (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী, ব্যারিস্টার শওকত আলী খান, অ্যাডভোকেট জেড আই খান পান্না, অ্যাডভোকেট শামসুদ্দিন বাবুল, অ্যাডভোকেট উম্মে কুলসুম রেখা, আসিফ নজরুল, ড. আনিসুজ্জামান, ড. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সৈয়দ শামসুল হক, শাহরিয়ার কবির, মাওলানা ইয়াহিয়া মাহমুদ, আলী যাকের, ডা. মুশতাক হোসেন ও অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী। রমনা থানার তৎকালীন ওসি এদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, বেআইনি সমাবেশ, হত্যার চেষ্টা, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার অভিযোগ আনেন। আদালত এদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। পরবর্তীকালে ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এই মামলা প্রত্যাহার করা হয়। এছাড়াও আন্দোলনের উদ্যোক্তা এবং সারাদেশে নেতা-কর্মীদের নামে নানান মামলা-হামলা, ভয়ভীতির মাধ্যমে আন্দোলন দমন করতে সচেষ্ট হয়।

গণআদালতে গোলাম আযমের বিচারের আন্দোলনে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তারা জাতীয় সংসদ থেকে রাজপথ, সর্বত্র আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে। সারাদেশে আওয়ামী লীগের বিস্তৃত সংগঠনের কারণে তা আন্দোলনকে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতেও সাহায্য করে। আওয়ামী লীগের সম্পৃক্ততা যতো বাড়তে থাকে ততোই সরকার একে যুদ্ধাপরাধের বিচারের আন্দোলনের চেয়ে সরকারবিরোধী আন্দোলন বলে মনে করতে থাকে। আন্দোলনের উদ্যোক্তা নাসির উদ্দিন ইউসুফ ও শাহরিয়ার কবিরের সাথে ২৮ মার্চ বৈঠকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর 'আপনারা আওয়ামী লীগের হাতে খেলছেন। তারা দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে চায়। গণআদালত করে আপনারাও তাই করছেন'[২২]- উক্তিই তার প্রমাণ। ৪ মার্চ আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় যুদ্ধাপরাধী ও পাকিস্তানি নাগরিক গোলাম আযমকে গণআদালতে বিচারের উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয় এবং অবিলম্বে এই ঘাতককে প্রচলিত আইনে বিচারের দাবি জানানো হয়।[২৩] গণআদালতের রায় বাস্তবায়নের দাবি তুলে ১৯৯২ সালের ১২ এপ্রিল জাতীয় সংসদে দীর্ঘ ১০ ঘণ্টাব্যাপী বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি ও বিরোধী দলের অংশগ্রহণে উত্তপ্ত এই বিতর্কে অংশ নিয়ে তদানীন্তন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা নানা তথ্য ও যুক্তি তুলে ধরে গণআদালতের রায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে সুস্পষ্ট ভাষায় সরকারের কাছে দাবি উত্থাপন করেন। তাহলেও ১৯৯৪ সালের পর বিরোধী দলগুলোর সরকারবিরোধী আন্দোলন শুরু হলে সেই আন্দোলনের প্রধান দল আওয়ামী লীগ সব বিরোধী দলকে একত্র করার স্বার্থে, অন্যকথায় জামায়াতে ইসলামীকে সরকারবিরোধী আন্দোলনে শরিক করার মানসে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আন্দোলন থেকে নিজেদের আলগোছে প্রত্যাহার করে নেয় বলে একটি অভিযোগ আন্দোলনের উদ্যোক্তা, কর্মী, সমর্থকসহ অনেকেরই। জাহানারা ইমামের আক্ষেপ থেকেও কিছুটা আঁচ করা যায়– 'আমি চারদিক থেকে আন্দোলন বানচালের নানা ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছি। জামায়াতি সাংসদরা এখন সংসদে বসে নানারকম সমঝোতা করার চেষ্টা করছে আমাদের আন্দোলনে সম্পৃক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে। তারা এবং সরকার নানাভাবে আন্দোলনে সম্পৃক্ত অন্যদের ওপর অন্য ধরনের পরোক্ষ চাপ প্রয়োগ করছে...।'[২৪] তাৎপর্যপূর্ণভাবে, পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেও পাঁচ বছরে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কোনো উদ্যোগ নেয়নি। সেই সময় গণআদালতের বিরুদ্ধে আরেকটি প্রচারণা চলছিল। মূলত স্বাধীনতাবিরোধীদের পক্ষে থাকা একটি অংশ, যারা কোনোভাবেই চায় না দেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হোক, আবার এর পক্ষে জনসমর্থনের ব্যাপকতার কারণে সরাসরি বিরোধিতাও করতে পারছে না, তারাই গণআদালতকে দেশের আদালতের প্রতি চ্যালেঞ্জ, সংবিধান পরিপন্থী ইত্যাদি বলে বিরোধিতায় সচেষ্ট হয়। সে সময় এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে সাপ্তাহিক রোববার গোষ্ঠী (১৯৯২ সালের রোববারের বিভিন্ন সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। স্বাধীনতাবিরোধী চক্রও একে লুফে নিয়ে ব্যাপক প্রচারণায় লিপ্ত হয়। যদিও প্রকৃত অর্থে গণআদালত সংবিধান ও রাষ্ট্রবিরোধী কোনোটাই ছিল না। কেননা আদালতের রায়ে কাউকে দণ্ড দেয়া হয়নি। বরং বলা হয়েছে, গোলাম আযমের অপরাধ মৃত্যুদণ্ডতুল্য, তাই এর বিচারের উদ্যোগ নিতে সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। আর কোনো বৃহৎ জনগোষ্ঠীর পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের দাবি-দাওয়া বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানানো সব রাষ্ট্র ও সমাজে সাধারণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বলে স্বীকৃত। তদুপরি 'বিবেকের আদালত' গঠন করে কোনো অপরাধের তদন্ত, সত্যাসত্য তুলে ধরে বিচারের দাবি জানানো একটি স্বীকৃত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রথা।

সেই সময়কার একটি পোস্টার

অন্যদিকে জামায়াত, তাদের মুখপত্র দৈনিক সংগ্রাম ও তার ছাত্র সংগঠন ছাত্রশিবির; ফ্রিডম পার্টি ও তাদের পত্রিকা দৈনিক মিল-াত; দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক দিনকাল; আনোয়ার জাহিদের নেতৃত্বে গঠিত 'যুব কমান্ড' ইত্যাদি সংগঠন তাদের সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে গণআদালতের বিরুদ্ধে। আন্দোলন সংশি-ষ্টদের 'ভারতীয় দালাল', 'মুরতাদ' ইত্যাদি ঘোষণা করা, তাদের চরিত্র হননের সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো, নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা, হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা দায়েরের মাধ্যমে আন্দোলনকে স্তব্ধ করা বা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার এক নিরন্তর প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। গণআদালতের রায় প্রকাশের দিন রাজধানী ঢাকার দৈনিক বাংলার মোড়ে 'ভারতীয় দালাল প্রতিরোধ কমিটি' নামক একটি সংগঠন তাদের ভাষায় '৪০ জন ভারতীয় দালাল' নামক একটি তালিকা প্রকাশ করে। এর আগে দৈনিক মিল-াতেও অনুরূপ একটি তালিকা প্রকাশিত হয়।[২৫] যাদের প্রায় সবাই নির্মূল কমিটি ও গণআদালতের সাথে সম্পর্কিত। ১৩ মার্চ ১৯৯২ তারিখে সমন্বয় কমিটির ৪ জন প্রতিনিধির সাথে সরকারের প্রথম দফা আলোচনা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় মন্ত্রণালয়ের অসৌজন্যমূলক আচরণের কারণে। সেখানে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরীর 'গণআদালত আইনের পরিপন্থি' মন্তব্যের জবাবে ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ তা আইনের সমান্তরাল নয় বলে জানান।[২৬] ১৮ তারিখে পুনরায় বৈঠক হয় জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের প্রতিনিধিদলের সাথে। বৈঠকে মতৈক্য হয়নি। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বিষয়ে শিগগিরই সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে জানান।[২৭] ৩০ মার্চ তার সাথে আলোচনা ছাড়াই গণআদালতের উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারিতে সংক্ষুব্ধ হয়ে পদত্যাগ করেন তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল আমিনুল হক।[২৮] গণআদালত ও গোলাম আযম ইস্যুতে সরকারের অবস্থান ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা।[২৯] বিরোধীদলীয় নেতাদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর আলোচনা[৩০], গোলাম আযমকে আমির পদ থেকে সরানোর জন্য জামায়াতকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুরোধ[৩১] ইত্যাদি প্রমাণ করে এই আন্দোলন সরকারকেও কতোটা ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত সরকার বিরোধী দলগুলোর সাথে একটি চার দফা চুক্তি করতে বাধ্য হয়। যদিও পরবর্তীকালে এই চুক্তির ভাগ্য কী হলো সেই সম্পর্কে আর কিছু জানা যায়নি।

গণআদালতের প্রথম বর্ষ পূর্তির দিনে ১৯৯৩ সালের ২৬ মার্চ সমন্বয় কমিটি একাত্তরের শীর্ষ ঘাতক-দালাল ও যুদ্ধাপরাধীদের অপরাধ উদ্ঘাটনের লক্ষ্যে ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি গণতদন্ত কমিশন গঠন করে। বেগম সুফিয়া কামাল ও ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ যথাক্রমে কমিশনের চেয়ারপার্সন ও সমন্বয়কারী নিযুক্ত হন। ১ বছর ধরে তদন্তের পর ১৯৯৪ সালের ২৬ মার্চ কমিশন আব্বাস আলী খান, মতিউর রহমান নিজামী, মোঃ কামারুজ্জামান, আবদুল আলীম, দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, মওলানা আবদুল মান্নান, আনোয়ার জাহিদ ও আবদুল কাদের মোল-া এই আট স্বাধীনতাবিরোধীর অপরাধের তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এর পরের বছর ২৬ মার্চ ১৯৯৫ আরও ৮ জনের বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এরা হলেন– এ এস এম সোলায়মান, সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী, আবদুস সোবহান, এ কে এম ইউসুফ, মোহাম্মদ আয়েন উদদিন, আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, এ বি এম খালেক মজুমদার ও ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন। কমিশন তার প্রতিবেদনে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম (ট্রাইব্যুনাল) অ্যাক্ট ১৯৭৩-এর আওতায় এদের বিচারের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ পেশ করে। একই সাথে এ সংক্রান্ত পূর্বে বাতিলকৃত আইনগুলো পুনরুজ্জীবিত করে, সেসবের আওতায়ও এসব অপরাধীর বিচার করার সুপারিশ করে। অন্যদিকে স্বাধীনতাবিরোধীরা আন্দোলনের সাথে সংশি-ষ্টদের বিকৃত ও কুরুচিপূর্ণ পোস্টার (যেমন-কুকুরের শরীরে মাথার জায়গায় সুফিয়া কামালের মুখমণ্ডল কিংবা জাহানারা ইমামের জিভ বের করা কার্টুন ইত্যাদি) সারাদেশে প্রচার করে ঘৃণ্য আচরণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। আর বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক অ্যাপারেটাস থেকে প্রচার-প্রচারণা তো ছিলই।

নানান ঘাত-প্রতিঘাত, সরকারের বিরোধিতা, অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকারের অভাব, সাংগঠনিক অন্তর্ঘাত, স্বাধীনতাবিরোধীদের অব্যাহত প্রচারণা ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর নিয়ামক হিসেবে কাজ করা বিভিন্ন শক্তির বিরোধিতা ও অপতৎপরতার ফলে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবার তৃতীয় প্রচেষ্টাটিও সফল হয়নি। বরং ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানিদের অনুগত/সাজানো আব্দুল মোত্তালিব মালিকের সরকারে জামায়াত নেতা আব্বাস আলী খান ও একেএম ইউসুফের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের[৩২] পর স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীনতাবিরোধীদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বিএনপির ঘাড়ে চেপে ২০০১ সালে প্রথমবারের মতো স্বনামে ক্ষমতার অংশীদার হয়ে ওঠে জামায়াতে ইসলামী।

২৬ জুন ১৯৯৪-এ জাহানারা ইমামের মৃত্যুতে আন্দোলন অনেকটাই স্থবির হয়ে যায়। সমন্বয় কমিটির কার্যক্রমও বন্ধ হয়ে যায় এক সময়। তা সত্ত্বেও এ দেশের মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী প্রজন্ম এবং ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে যুদ্ধাপরাধের বিচারের বিষয়টিকে নিয়ে যেতে গণআদালতের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। ক্ষুদ্রভাবে হলেও নির্মূল কমিটি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিটি জারি রেখেছে গত ১৮ বছর ধরে। এজন্য তাদের ওপর এসেছে নানান প্রত্যাঘাত, হয়রানিমূলক মামলা, রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন ইত্যাদি। এর পাশাপাশি বিজ্ঞানসম্মতভাবে একাত্তরের গণহত্যার তথ্য-প্রমাণ, বধ্যভূমি আবিষ্কার, খনন ও সেখান থেকে নরকঙ্কাল উদ্ধার করা, বর্তমান প্রজন্মকে সেসব ইতিহাস অবহিতকরণের জন্য নানান কর্মসূচি গ্রহণের কাজটি করে চলেছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। প্রকৃতপক্ষে, এদের অব্যাহত কর্মযজ্ঞই যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে ২০০৭ সালে আরেকটি আন্দোলন গড়ে তোলার তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশের ইতিহাস বিশে-ষণ করলে একটি বিষয় চোখে পড়বার মতো। সেটা হলো– প্রতি দশক অন্তর অন্তর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে এক-একটি আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে এখানে। ১৯৭১, ১৯৮১-র পর ১৯৯২ যা জোরালোভাবে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত চলে। এরপর ২০০৭ সালে আরেকটি আন্দোলন গড়ে উঠেছে। ২৭ মার্চ ২০০৭ তারিখে বর্তমান সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদের সাথে পত্রিকার সম্পাদকদের এক আলোচনায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি উত্থাপিত হলে তিনি এ ব্যাপারে সহমত পোষণ

করেন এবং সরকারকে অবহিত করবেন বলে জানান। ধীরে ধীরে এদের বিচারের প্রসঙ্গটি জোরালো হয়ে উঠতে থাকে। সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের লক্ষ্যে নানা কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। এরপর নির্বাচন কমিশনে রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, এলডিপি, বিকল্পধারা, জাসদ '৭১-এ যুদ্ধাপরাধের দায়ে জামায়াতের নিবন্ধন না করার দাবি উত্থাপন করে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এটিএম শামসুল হুদাও বিষয়টির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেন এবং এক্ষেত্রে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে বলে জানান। এই রকম পরিস্থিতিতে গত ২৫ অক্টোবর নির্বাচন কমিশনের সাথে সংলাপের পর সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময়, "বাংলাদেশে কোনো যুদ্ধাপরাধী নেই। এটা তাদের কল্পনাপ্রসূত, বানোয়াট, একটা উদ্ভট চিন্তা"[৩৩] বলে মন্তব্য করেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ। পরদিন একুশে টিভির এক টকশোতে সাবেক সচিব ও ইসলামী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান শাহ আব্দুল হান্নান একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে 'গৃহযুদ্ধ' নামে আখ্যায়িত করেন। এরপর গত ৩০ অক্টোবর জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল কাদের মোল-া বলেন, 'কেউ সুন্দরী নারীর লোভে, কেউ হিন্দুর সম্পত্তি লুণ্ঠন, কেউ ভারতীয় স্বার্থ রক্ষায় মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়'।[৩৪]

চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতাবিরোধীদের বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ অর্জন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এসব অবমাননাকর মন্তব্য সারাদেশে প্রবল আলোড়ন তোলে, যা তাদের বিচারের দাবিকে আরো বাস্তব ও জোরালো করে তোলে। এর সাথে সাথে উঠে আসে আরো কিছু মৌলিক প্রশ্ন। যেমন– হঠাৎ করে এধরনের প্ররোচনাদানকারী উক্তি করার পেছনে কী উদ্দেশ্য আছে? আবার, তারা নিজেরা যুদ্ধাপরাধী কিনা সে ব্যাপারে তারা কথা বলতে পারে, কিন্তু দেশে কোনো যুদ্ধাপরাধী রয়েছে কিনা সেটা তারা সুনিশ্চিত হলো কীভাবে? তাহলে কি যুদ্ধাপরাধী সংক্রান্ত তথ্যের একমাত্র হেফাজতকারী তারাই? সেটা যদি হয়ে থাকে তাহলে তার সূত্র কি? বাংলাদেশের সংবিধান লঙ্ঘন করে মুক্তিযুদ্ধকে 'গৃহযুদ্ধ' বলে বিতর্ক খুঁচিয়ে তোলার অপচেষ্টাইবা কেন? ইতোমধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে আব্দুল কাদের মোল-ার বিরুদ্ধে মাদারীপুরের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে গত ৮ নভেম্বর একটি এবং ১১ নভেম্বর দু'টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।[৩৫] বিশেষ ট্রাইব্যুনালের পাশাপাশি সামরিক আদালতে তাদের বিচারের দাবি তুলেছেন দু'জন সাবেক সেনাপ্রধান মে. জে. (অব.) কে এম সফিউল-াহ ও লে. জে. (অব.) মুস্তাফিজুর রহমান।[৩৬] গত ৩১ অক্টোবর '০৭ তারিখে সম্পাদকদের সাথে বৈঠকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদও 'যুদ্ধাপরাধীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে, সেটা আমার কাছেও অনভিপ্রেত'[৩৭] এই উক্তি করেন। অন্যদিকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্নে বর্তমান আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের, "এসব বিচারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সরকার কাজে বাধাগ্রস্ত হতে চায় না। বেশি ক্ষেত্রে জড়িয়ে পড়লে সমস্যায় পড়তে হবে। সরকার এ কাজে হাত দেবে এতো বোকা নয় ... যুদ্ধাপরাধীদের যারা ৩৬ বছর বিচার করেননি তাদের জিজ্ঞেস করুন বিচার না করার অপরাধে তাদের কী শাস্তি হওয়া উচিত"[৩৮] গণমাধ্যমে এই মন্তব্য করে এ বিষয়ে সরকারের অবস্থান সম্পর্কে দ্বিতীয় একটি চিন্তার জন্ম দেন। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি দখলদার সশস্ত্রবাহিনীর সাথে মিলে তাদের এদেশীয় অংশ রাজাকার বাহিনী এবং সহযোগী আলবদর, আলশামস, শান্তি কমিটির সদস্যরা যেসব যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগসহ অন্যান্য মানবতাবিরোধী অপরাধে লিপ্ত হয়েছিল তার বিচারের জন্য আমাদের জাতীয় আকাঙ্ক্ষারই বহির্প্রকাশ ঘটছে এসব আন্দোলনের মাধ্যমে। বর্তমানে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্যোগ নেয়ার জন্য জনমত ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠছে। '৩৬ বছরের জঞ্জাল' সাফ করার জন্যই বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেছে– সরকার সংশি-ষ্ট কর্তাব্যক্তিদের প্রায়শই এমন একটি কথা বলতে শোনা যায়। '৭১-এর যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতাবিরোধীদের বিচার না করার ক্ষতটিও আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি গত ৩৬ বছর ধরে। তাই এই বিষয়ে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উদ্যোগী হওয়া জরুরি বলে মনে করি।q

গণআদালতের ছবি : পাভেল রহমান

অন্তটীকা

১ সাপ্তাহিক জাগরণ, লন্ডন, ৫ এপ্রিল ১৯৮১; উদ্ধৃত- গণআদালতের পটভূমি, শাহরিয়ার কবির, পৃ: ১৬
২ সংবাদ, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯২
৩ গণআদালতে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র, ড. আনিসুজ্জামান; বিচিত্রা ২৪ জুলাই ১৯৯২, পৃ. ২১
৪ বিচিত্রা, ২১ আগস্ট ১৯৯২, পৃ. ২৫-২৬
৫
৬ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেক্ষিত ও গোলাম আযম, আবু সাইয়িদ
৭ ভোরের কাগজ, ১৫ নভেম্বর ০৭
৮ সংবাদ, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯২
৯ আজকের কাগজ, ২ জুন ১৯৯৪
১০ সংবাদ, ২২ জানুয়ারি ১৯৯২
১১ ভূমিকা, গণআদালত প্রসঙ্গে (বাসদ থেকে প্রকাশিত), জুন ১৯৯২
১২ সংবাদ, ২ মার্চ ১৯৯২
১৩ ঐ, ৪ মার্চ ১৯৯২
১৪ ঐ, ৮ মার্চ ১৯৯২
১৫ ঐ, ২০ মার্চ, ৯২
১৬ ঐ, ২৩ মার্চ ৯২
১৭ ঐ, ২৪ মার্চ ৯২
১৮ ঐ, ২৬ মার্চ ৯২
১৯ ঐ, ২৬ মার্চ ৯২
২০ ঐ, ২৭ মার্চ ৯২
২১ রোববার, ৩ মে ১৯৯২
২২ গণআদালতের পটভূমি, (১৯৯৩), পৃ. ১১৭
২৩ বিচিত্রা ১৩ মার্চ ১৯৯২
২৪ গণআদালতের স্মৃতি/জাহানারা ইমামের চিঠি (২৩.০২.১৯৯৪)- আসিফ নজরুল, ঈদ সংখ্যা, দৈনিক প্রথম আলো, ২০০৪
২৫ রোববার, ১২ এপ্রিল ১৯৯২
২৬ সংবাদ ১৪ মার্চ ১৯৯২
২৭ ঐ, ১৯ মার্চ ১৯৯২
২৮ ঐ, ৩১ মার্চ ১৯৯২
২৯ ঐ, ২ এপ্রিল ১৯৯২
৩০ ঐ, ৮ এপ্রিল ১৯৯২
৩১ ঐ, ৯ এপ্রিল ১৯৯২
৩২ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: ৭ম খণ্ড (২০০৩), পৃ. ৫৪০
৩৩ সমকাল ২৬.১০.০৭
৩৪ প্রথম আলো, ৩১ অক্টোবর ০৭
৩৫ সমকাল ১২.১১.০৭
৩৬ ঐ
৩৭ আমাদের সময় ১.১১.০৭
৩৮ ঐ, ১২.১১.০৭